সন্ত কবি কবীর ও বাউল কবি লালন ফকির : তুলনাত্মক অধ্যয়ন

হুসনে বানু ✉

বাংলা বিভাগ, শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউসান (কলেজ), শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০২

Email: drhusnebanu@gmail.com

ভারতবর্ষে এক রহস্যবাদী সাধক সম্প্রদায় অসংখ্য উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক কাব্য সংগীত রচনা করেছিলেন – সেগুলি কখনো গীতি আকারে, কখনো বা দোঁহা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই আধ্যাত্মিক কাব্য সংগীত বা দোঁহাগুলি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তবে এর মধ্যে সুফী প্রেমধর্মাদর্শের বিমিশ্রণ ঘটেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব প্রগতিবাদ, জৈনের হিংসা ও সুফীমার্গের সাধনাদর্শের প্রভাব এই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধারার দুজন প্রখ্যাত কবি হলেন – সন্ত কবি কবীর ও বাউল কবি লালন ফকির।

কেউ বলেছেন "সন্ত কবীর", কেউ বা বলেছেন "কবীর সাহব"; আবার কেউ বা শুধুমাত্র "কবীর"। তবে যে নামেই তিনি নামাঙ্কিত হোন না কেন, তাঁর ব্যক্তিত্বাপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আর বাণীর রমণীয় সুরেলা টানে তিনি সকলের কাছেই 'কবি' হিসাবে পদবাচ্য। তিনি কোনো "রামকাহিনী"ও কাগজে – কলমে বিবৃত করেননি। বলা বাহুল্য, সমস্তই তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী। মৌখিক পরম্পরার একজন মানুষ হিসাবে তাঁর কথা -- "মসী কাগজ ছুঁয়ো নহী, কলম গহী নহি হাথ,চারি যুগ কে মহাতম, কবীর মুখহি জনঈ বাত"। বাংলাদেশে অষ্টাদশ –ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনই একজন বাউল কবির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তিনিও বাউলগান রচনা করেছিলেন। একতারা ছিল তাঁর গানের সহচর। বাউল সংগীতকারদের মধ্যে সেই লালন ফকিরের নাম সুবিখ্যাত। তিনিও 'বাউল শিরোমণি' আখ্যায় বিভূষিত।

মধ্যযুগীয় অন্য সন্ত কবি ও ভক্ত কবিদের সমানধর্মা কবি কবীরের জীবনবৃত্তান্ত প্রায় অন্ধকারময়। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, বাসস্থান, বংশ আর এমনকি যথার্থ নাম সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে কিছু বলা সমীচিন হবে না। বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন সিকন্দর লোধীর সমকালীন। তবে জয়দেব ও নামদেব তাঁর পশ্চাৎবর্তী ছিলেন। আবার সন্ত কবি পীপা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি সন্ত কবি পীপার অগ্রজ। 'কবীর চরিত্রবোধ'-এ ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্যেষ্ঠ সুদী পূর্ণিমা সোমবারে কবীরের জন্ম –তিথি স্বীকার করা হয়েছে – যার আধারস্বরূপ দোঁহায় আছে –"চৌহদ সী পচপন সাল গএ চন্দ্রপর এক ঠাঠ ঠএ। /জেঠ সুদী বরসায়ত কো পূরণমাসী প্রগট ভএ।।"- কবীরের জন্ম সম্পর্কিত এই শ্লোক নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নেই। ড. শ্যামসুন্দর দাস দোঁহাতে 'গএ' শব্দের অর্থ ছাড়া ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কবীরের জন্ম সাল উল্লেখ করেছেন। ড. হাজারীপ্রসাদও এই মতকে স্বীকৃতি জানালেও ড. মাতাপ্রসাদ গুপ্তের ন্যায় বিদ্বানেরা ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা সোমবার কবীরের জন্মতিথির উল্লেখ করেছেন।তবে এই ১৪৫৫ সালটিকে জন্মসাল হিসাবে গণ্য করা উপযুক্ত ও তর্কসংগত। বাউল কবি লালন ফকিরের জীবনী সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্যবিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। অনুমিত হয়, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তীর প্রচলন আছে। কারোর মতে, একজন বিধবা ব্রাহ্মণী লোক – লাজ বশবর্তী হয়ে স্বীয় নবজাত শিশু কবীরকে কাশীর লহরতারা নামক তালাব –এর নিকটবর্তী স্থানে ফেলে দিয়ে আসেন। তাঁকে পালন – পোষণ করে বড় করে তুলেছিলেন নিঃসন্তান জোলা দম্পতি নিরু আর নিমা। তাদের কোনো সন্তান না থাকায় তারা মায়া পরবশ হয়ে ঈশ্বরের দানস্বরূপ শিশুটিকে গ্রহণ করেন। তাদের পরিচয়েই কবীর জোলার ছেলে হিসাবে পরিচিত হতে থাকেন। তবে এই বিষয়ে একটি গল্পকথা প্রচলিত আছে। সেটি হল—" রামানন্দের শিষ্য অষ্টানন্দ একদিন স্বর্গ থেকে লহর তালাও –এ জ্যোতি নেমে আসতে দেখে। গুরুকে সেকথা

জানালে রামানন্দ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা বলেন। এদিকে জোলা নিরু তার নববিবাহিত বউকে নিয়ে কাশীতে ফিরছিলেন । পথে জল পানের জন্য লহর তালাও –এ নামেন। পুকুরে ফুটে থাকা পদ্মের ভেতর একটি শিশুকে সে ভাসতে দেখে। নিমা শিশুটিকে সেখান থেকে তুলে আনে এবং বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নিরু রাজি হয় না। নানালোকে নানারকম কথা বলবে, এইসব বিবেচনা করে। কিন্তু শিশুটি নিজেই তাদের সমস্যার সমাধান করে বলে, পূর্বজন্মে তোমরা আমার অনেক সেবা করেছিলে – তাই এজন্মে তোমাদের সন্তান হয়ে মোক্ষলাভের ব্যবস্থা করব। শুধু তাই নয়, পূর্বজন্মে এরা নাকি ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু ধার্মিক জীবনযাপন না করার দরুন এজন্মে মুসলমান জোলার ঘরে তাদের জন্ম নিতে হয়েছে—এমন কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। " (কবীর – বীজক ও অন্যান্য কবিতা-সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-১৩,সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)। কিন্তু কবীরপন্থীরা একথা স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে, অমাবস্যার রাত্রিতে যখন সমগ্র নভোমণ্ডল ঘেরাটোপে মেঘাচ্ছাদিত ছিল; ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলক দেখা দিচ্ছিল, সেই সময়কালীন লহরতারা নামক তালাবে এক কমলের প্রস্ফুটন হয় – তারপর এক জ্যোতিতে তা রূপান্তরিত হয়েছে এবং এই ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতিই হল কবীর। এই সমস্ত কাহিনী কবীরকে অলৌকিক মহত্ত্ব প্রদান করার জন্যই হয়তো প্রতীত হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –" কবীরের নামকরণের সময় কাজি এসে কোরান খুলতেই চারটি শব্দ—কবীর, আকবর, কিবরা,কিবরিয়া—দৃষ্টিগোচর হয়।কোরান বন্ধ করে কাজি যতবারই খোলে ততবারই এক কাণ্ড। তাজ্জব কাজি চলে যায়। কিন্তু আবার একদিন এসে পূর্বঘটনার সম্মুখীন হলে রায় দেয়—একে মেরে ফেলা হোক। নিরু তখন কাজির বিচারে শিশুটিকে মারতে গেলে তার বুক থেকে কোনো রক্তই বেরোয় না, উলটে সে দোহা শুনিয়ে বলে তার এই দেহ আলোর রক্তমাংসের নয়। তখন কাজি বলে—এর নাম হোক 'কবীর' অর্থাৎ মহান।"(কবীর- বীজক ও অন্যান্য কবিত-সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১, সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)।তবে কোনো সৌভাগ্যবতী মাতা কবীরকে সুনিশ্চিতরূপে জন্ম দিলেও তার লালন – পালন জোলা পরিবারেই সুসম্পন্ন হয়। তিনি যে মুসলমান জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন,সে বিষয়ে সন্দেহাবকাশ নেই। সমালোচক ক্ষিতিমোহন সেন এ বিষয়ে বলেছেন—" সন্দেহ নাই যে কবীর মুসলমান জোলার পুত্র। এই কথাটি গোপন করিবার জন্য ভক্তমাল ও তাহার টীকা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সব হিন্দু লেখকই প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। ...যাক সে কথা,দাদুপন্থের নানাগ্রন্থে এবং আরো বহু বহু সাক্ষ্য অনুসারে ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে কবীর ছিলেন মুসলমান জোলার ছেলে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও দবিস্তান বলেন, 'কবীর জোলার বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' তাঁহারা বলেন, ' তবু তাঁহাকে ঠিক মুসলমান বলা যায় না, কারণ তিনি মুরহিদ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন।'(ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা,'নিবেদন', পৃষ্ঠা-৬৪,ক্ষিতিমোহন সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৩০)। বাউল কবি লালন ফকিরও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্ঠিয়ার কুমারখালির কাছে ভাঁড়রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বিবাহের পরে তীর্থ যাত্রাকালে পথিমধ্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গীসাথীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। তখন সিরাজ সাঁই নামক এক মুসলিম দরবেশ তাঁকে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করে তোলেন। এই সিরাজ সাঁই –এর কোনো পুত্র –সন্তানাদি ছিল না। তাই তিনি লালনকে নিজ পুত্রসম পালন করেছিলেন।

কবীরের জীবনসঞ্জাত অন্যান্য তথ্যের ন্যায় তাঁর প্রয়াণ সম্পর্কিত বিষয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ প্রচারে অবধের রতনপুর, পুরীএবং মগহর – এই তিনটি স্থানের নামোল্লেখ নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও গোরখপুর শহরের সামান্য দূরবর্তী স্থানে অমী নদীর তীরবর্তী বস্তি জেলার অন্তর্গত মগহরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।তবে এই মতবাদ বহুদিন ধরেই প্রচলিত। আবুল ফজলের ' আইন- ই-আকবরী'-তে (১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) রতনপুর এবং পুরী—উভয় ক্ষেত্রেই কবীরের সমাধির কথা উল্লিখিত। যদিও উপযুক্ত প্রামাণ্যাভাবের দরুণ রতনপুর প্রসঙ্গকথা অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পুরী স্থানটির ক্ষেত্রে কবীর ব্যতীত শ্রুতিগোপাল দাস,ধর্মদাস প্রমুখের সমাধি থাকার দরুণ বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। তাই সমাধিস্থ বা কবর

প্রাপ্তির সূত্রে এই তিনটি স্থানের মধ্যে কোনো একটি স্থানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।আবার কেউ কেউ এই মতকে অগ্রাহ্য করেছেন। তবে গোরখপুরের নিকটবর্তী মগহরে তাঁর প্রয়াণ ঘটেছিল – এই দাবী অনেক বেশী জোরালো ও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবীর পন্থীদের মতে ১৫৭৫ সংবতে (১৫১৮খ্রীষ্টাব্দ) মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে মগহরে সন্ত কবীরের মহাপ্রয়াণ ঘটে—" 'বীজক'-এ কথিত সেই 'ঊষর' মগহরে মরা গাঙে জোয়ার এল। কৃষিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের জীবনে সজল সরল আস্থা এনে তবেই মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন সন্ত কবীর।দীর্ঘকাল বিশুষ্ক অমী (অমৃত) নদীও ভক্তির আবেগে কল্লোলিনী।" (কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২৭, সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)।তবে তাঁর অন্তিম লীলা প্রদর্শনের সময় হিন্দু –মুসলমান উভয় পক্ষের মানুষ জড়ো হয়েছে।এদিকে রাজা বীরসিংহ বঘেল,বিজলী খাঁ ও তাদের লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তের সঙ্গে সঙ্গে আছে সন্তমণ্ডলী পদ্মনাভ, শ্রুতিগোপাল প্রমুখ শিষ্য এবং তাঁর সমসাময়িক রুইদাস(রবিদাস)। নামসংকীর্তন চলাকালীন তিনি রুইদাসকে বলেছেন,সকলে যাতে শান্ত হয়। এরপর তিনি পর্ণকুটিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন। বাইরে শোকাকুলা জনতা। সমালোচক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে- " অবশেষে শব্দ পাওয়া গেল বন্ধ দরজার ওপার থেকে। রুইদাসের নির্দেশ পেয়ে রাজা বীরসিংহ, শ্রুতিগোপাল এরকম দু-একজন এগিয়ে গেলেন। কিন্তু বাধ সাধল বীজলী খাঁ। কীভাবে সৎকার হবে? দাহ না দাফনা ? এই নিয়ে তর্ক, বাদানুবাদ। জন্ম,প্রতিপালন,গুরু –এইসব দেখা দরকার। কোন শিষ্যরা তাঁর সংখ্যায় বেশি – হিন্দু না মুসলমান? হাওয়া ক্রমশঃ গরম হয়ে ওঠে বাদ-প্রতিবাদে। তবে যুদ্ধেই ফয়সালা হোক কে এই মরদেহের অধিকারী?

সব প্রস্তুত। যুদ্ধ শুরু হোক।এমন সময় আকাশবাণী হল—চাদর খুলে দেখ। দেহ নেই। শুধু শুধু লড়াই করে মরবি।

দরজা খুলে দেখা গেল বাস্তবিক তাই। শুধু চাদর আর ফুল পড়ে আছে। দেহ নেই। তাহলে উপায়? বয়োজ্যেষ্ঠ রুইদাসের পরামর্শ অনুযায়ী বীরসিংহ পেল ফুল আর বিজলী খাঁ পেল চাদর। ফুল দাহ করে আর চাদর গোর দিয়ে হল উভয়পক্ষের সৎকার।"(কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-২৭-২৮,সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)। যদিও এই নিয়ে নানা গল্পকথা প্রচলিত। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতিমোহন সেন মন্তব্য করেছেন-" এই দেহ লইয়া বিবাদ কেন হইল বুঝা যায় না। কারণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও তো সাধকের দেহ দাহ করার নিয়ম নেই।" (মধ্যযুগে সাধনার ধারা- ক্ষিতিমোহন সেন,পৃষ্ঠা- ৬৫ , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০)।

বাউল কবি লালনের তিরোভাব কাল সম্বন্ধেও বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। ১২৯৭ সালে কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়া থেকে 'হিতকরী' নামে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকাতে লালনের মৃত্যু সংক্রান্ত একটি তথ্যের প্রকাশ ঘটে। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে,১৭-ই অক্টোবর শুক্রবার লালন দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১১৬ বৎসর বয়স্ক ছিলেন।'হিতকরী' পত্রিকার ঐ পুরনো অংশটুকু লালনের আখড়ায় সংরক্ষিত। কিন্তু তারিখের অংশটুকু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই। মতিলাল দাস মহাশয় এই অংশটুকু দেখিয়েছিলেন। লালনের মৃত্যু সংবাদ সংবলিত অংশটুকু ১২৯৭ সালের 'হিতকরী'-রই অংশ, সে বিষয়ে সন্দেহাবকাশ থাকে না। সুতরাং লালনের মৃত্যু সন বাংলা ১২৯৭ সালের ১-লা কার্তিক,ইংরাজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭-ই অক্টোবর।

কবীরের দীক্ষাগুরু ছিলেন স্বামী রামানন্দ। তা তাঁর কথন থেকেই স্পষ্টায়িত হয়ে ওঠে। কবীরের মতানুসারে, 'কাশী মে হম প্রগট ভয়ে, রামানন্দ চেতায়ে।'- এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় নাভাদাসের 'ভক্তিমাল' কাব্য আর অনন্তদাসের 'প্রসঙ্গ পারিজাত' গ্রন্থদ্বয়ে। তবে কোথাও কোথাও কবীরের গুরু হিসেবে রামানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—" কবীর-বচনের প্রাচীন সংকলন-গ্রন্থ হিশেবে শিখদের 'আদিগ্রন্থ', রাজস্থানী পরম্পরায় 'কবীর গ্রন্থাবলী', 'কী কবীর-পন্থের ধর্মগ্রন্থ বীজক'—এই তিনটি সংকলনে

কবীরের গুরু হিশেবে রামানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও 'বীজক'-এর 'সবদ'(শব্দ) অধ্যায়ের ৭৭সংখ্যক পদের চতুর্থ দ্বিপদীতে 'রামানন্দ রামরস মাতে। কহৈ কবীর হম কহি কহি থাকে' পাওয়া যায়। কিন্তু তার অর্থ,(বৈষ্ণব)রামানন্দের রামরস পান করে কবীর বার বার ক্লান্ত হয়ে পড়ল না। অন্তত এক্ষেত্রে কবীর-পন্থী পূরণদাসকৃত 'বীজক'-এর টীকার বক্তব্য অনুধাবন করলে তা মনে হয় না। যদিও পূরণদাস আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জানিয়েছেন, 'বিষয়ানন্দ, জগদানন্দ, যোগানন্দ, গন্ধর্বানন্দ,দৈবানন্দ এবং ত্রিগুণানন্দ—এইসবই যে আনন্দের মধ্যে লয় হয়ে যায়,সেই সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দই হল রামানন্দ।' মনে রাখা দরকার কবীর বা তাঁর মতো সন্ত-ভাবান্দোলনের প্রথম দিককার সন্তকবিরা তাঁদের মানব গুরুর নামোচ্চারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নীরব ছিলেন।'গুরু' কিংবা 'সদগুরু' বলতে তাঁরা আত্মগম্য পরমগুরু বা শ্রীগুরুর কথাই বলতে চেয়েছেন।"(কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২১, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১)। আবার কিছু পণ্ডিতবর্গ কবীরের গুরু হিসাবে শেখ তকী-র কথা বলেছেন। সমালোচক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-"রামানন্দ ছাড়াও কবীরের গুরু হিশেবে আরো দু-একজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের একজন পীতাম্বর পীর,অন্যজন শেখ তকি। পীতাম্বর পীরের বিষয়টি খুব একটা জোরালো সমর্থন না পাওয়ায় মোটামুটি পরিত্যক্ত। কিন্তু শেখ তকির প্রসঙ্গ, কবীরের গুরু -সংক্রান্ত বা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন কিংবদন্তির সূত্রে ঘুরে ফিরে আলোচনায় উত্থাপিত হয়। এর জন্য মৌলবি গুলাম সরবারের 'খজিনং-উল-অসফিয়া'-র(১৮৬৮খ্রিঃ)ভূমিকাও রয়েছে। এছাড়া 'বীজক'-এর ৪৮সংখ্যক রমৈনীতে এবং ৬৩সংখ্যক রমৈনীর সাখীতে শেখ তকির উল্লেখের সূত্রেও প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়ে থাকে।" (কবীর- বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-২২, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১) ।আবার রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন-" কবীরপন্থ মে মুসলমান ভি হৈ। উনকা কহনা হৈ কি কবীর নে প্রসিদ্ধ সুফী মুসলমান ফকীর শেখ তকী সে দীক্ষা লে থী। বে উস সুফী ফকীর কো হী কবীর কা গুরু মানতে হৈ।"(হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস- আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল, পৃষ্ঠা-৪৯, লোকভারতী প্রকাশন,২০০২,এলাহাবাদ) । আবার বিশপ ওয়েস্টকটের 'কবীর অ্যান্ড দি কবীর পন্থ'-এ (১৯০৭) ঝুঁসির শেখ তকিকে কবীরের গুরু হিশেবে দাবির সুত্রে প্রাচ্য- পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মহলেই বিষয়টি বিতর্ক- সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। যাইহোক,এই সুত্রে 'বীজক'-এর ৪৮ সংখ্যক রমৈনীতে কবীরের বক্তব্য বা তাঁর বাচন-ভঙ্গি লক্ষ্য করলে শেখ তকির ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরে কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তাও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে ওঠে।"(কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সঙ্কলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-২২ , সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)। কিন্তু এই বক্তব্য সর্বত্র অমান্যকর। কারণ কবীর শেখ তকী-র প্রতি কোথাও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। 'সুনহু শেখ তকী তুম'- এই শব্দের মধ্য দিয়েই কঠোরতা আর কর্কশতার বহিঃপ্রকাশ। আর এখানেই গুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকটিত হয়নি। অন্যদিকে বাংলার অন্যতম বাউল কবি লালনের দীক্ষাগুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই। যে সিরাজ সাঁই তাঁর প্রাণধারণ করেছিলেন। ফলতঃ গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁর প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করলে তিনি সিরাজের কাছেই ফকিরী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য হন। প্রসঙ্গক্রমে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন -" সিরাজ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাঁহার স্ত্রী লালনকে রোগযন্ত্রণায় অজ্ঞান অবস্থায় পথের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া লালনকে উঠাইয়া লইয়া সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে নিরাময় করেন। ঐ রোগে লালনের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ ফকিরের কোনো সন্তানাদি ছিল না, তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে লালনকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। লালন তাঁহাদের নিকট সন্তানবৎ প্রতিপালিত হইতে থাকেন এবং শেষে সিরাজের নিকট হইতে ফকিরি-ধর্মে বা বাউল-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।" (বাংলার বাউল ও বাউল গান- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য- 'ফকির লালন শাহ',পৃষ্ঠা-৮,ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি,প্রথম প্রকাশ, দীপান্বিতা,১৩৬৪,কলকাতা)

কবীরের জোলা পরিবারে লালিত – পালিত হবার জন্য বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন সমালোচকেরা। সমালোচক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —" শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কবীর 'কাশীর জোলা' বা কখনো শুধু জোলা হিশেবে একাধিকবার নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু একবারও নিজেকে মুসলমান বলেননি।" (কবীর-বীজক

ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-২৫, সাহিত্য অকাদেমি,২০০১) ।এমনকি কবীরের জবানিতে এমন কথাও পাওয়া যায়- " পূরব জনম হম ব্রাহ্মণ হোতে বৌছে করম তপ হীনা।/ রামদেবকী সেবা চূকা, পকরি জুলাহা কীন্হা।।" (২৫০) অর্থাৎ পূর্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ হয়েও তপস্যাহীন ছিলাম,নীচ কর্মে লিপ্ত থেকে রামের সেবা করতে ভুলেছি।তাই আমায় ধরে জোলা করে দিয়েছেন। যদিও এই কথায় কর্মফল ও পুনর্জন্ম -সংক্রান্ত হিন্দুদের ধারণা সক্রিয় রয়েছে।"(কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-১৫ সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)। ড. বড়ব্যালের মতে, কবীর মুসলমান হবার পূর্বে যোগীর অনুরাগী ছিলেন। ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী কবীরকে 'যুগী'জাতির সঙ্গে জুড়েছিলেন।এই জাতি হিন্দু জাতির মধ্যে বড় অস্পৃশ্য আর হেয় হিসাবে পরিগণিত – এর সম্বন্ধ নাথপন্থী যোগীদের সঙ্গে। পরে তিনি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য - " কবীর যে প্রাচীন 'কোরী'-দের অন্তর্গত ছিলেন এবং মুসলমান হবার আগে ওই কোরীদের সঙ্গে 'জোগী'-দের(যোগী) সম্পর্ক ছিল, পীতাম্বরদত্ত বড়থ্বালও তা জানিয়েছিলেন তাঁর 'যোগ-প্রবাহ'(২০০৩) সংবৎ গ্রন্থে। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ড. বড়থ্বালের সেই বিচারই আরো সবিস্তারে সমর্থন করেন বলে মন্তব্য করেছেন কেদারনাথ দ্বিবেদী (কবীর ঔর কবীর- পন্থ)। যাইহোক, যোগী বা 'জোগী'-রা যে আলাদা ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের থেকে, সে বিষয়ে কবীরের একটি পদেও উল্লেখ পাওয়া যায়— জোগী গোরখ গোরখ করৈ। হিন্দু রাম রাম উচ্চরৈ। মুসলমান কহৈ এক খুদাই। কবীর কো স্বামী ঘটি ঘটি রহয়ো সমাই। গোরখনাথের নাম নিত যারা তারাই ছিল জোগী বা যোগী। তাহলে, হিন্দু যোগী এবং মুসলমান এরা সব আলাদা।" (কবীর- বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা-২৭ , সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)।সমালোচক আরো বলেছেন- "উত্তর ভারতে বৈষ্ণব রামানন্দের এবং সেই সময় সুফি সাধকদের প্রভাবের কথা মনে রাখলে,ভক্তি-সাধনমার্গে রামানন্দের পরব্রহ্ম রামের নাম দিয়ে কবীর যে তাঁর চিরসখাকে সুফিদের মতো আত্মধর্মের উদ্‌বোধনে অনুসন্ধান করেছিলেন,এ নিয়ে হয়তো সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁর হৃদয়-নন্দন-বনের নিভৃত নিকেতনে সেই আনন্দমূল পুরুষোত্তমের বন্দনা গাইবার জন্য কণ্ঠী-মালা-তিলক-টুপি এসব তাঁর প্রয়োজন হয়নি। যদিও পরবর্তীকালে নানা কাল্পনিক ছবিতে এসবও তাঁর অঙ্গে জুটেছে। কিন্তু তাঁর শব্দ-গান, মধ্যযুগে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যেসব গৌণ ধর্মমত গড়ে উঠেছিল—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অনুরণন তুলেছে এবং তার প্রতিধ্বনি আয়তনবান হয়ে ডাক দিয়েছে পরবর্তী পথিকদের।"(কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা- সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃষ্ঠা- ২৩ ,সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)। লালন ফকিরও প্রথমে হিন্দু ধর্মে জন্মগ্রহণ করলেও সেই হিন্দু সমাজ ও কুল ত্যাগ করে ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর গুরুর সঙ্গে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পর গুরুর মৃত্যু সংঘটিত হলে আনুমানিক ১২৩০ সালে গোরাই নদীর তীরবর্তী সেঁউড়িয়া নামক পল্লীতে লালন এসে উপস্থিত হন। দেশের প্রতি একটা অসম্ভব রকম টানানুভবের জন্য তিনি সেখানে একটি স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেন।সেই স্থানে বহু মুসলমান তন্তুবায় (জোলা) সম্প্রদায়ের বাস থাকার দরুণ তিনি এক মুসলমান জোলা রমণীকে নিকা করে তারই বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন এবং সেই স্থলই তাঁর আখড়ায় রূপান্তরিত হয়।

সন্ত কবীরের পরমানুরাগী হিসেবে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। নাভাদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে যেমন পদ্মনাভ,প্রিয়াদাসের টীকায় তেমনি তত্ত্বা ও জীবার নাম পাওয়া যায়। রাঘবদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে কমাল,কমালী, পদ্মনাভ, রামকৃপাল,নীর,খীর, জ্ঞানী, ধর্মদাস ও হরদাস—এই ন'জন শিষ্যের নাম পাওয়া গেছে।তবে এঁদের সঙ্গে কবীরের যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল তা টীকাকার চতুর্দাসের (আনুমানিক ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) উক্তি থেকে জানা যায়। তবে কবীর পদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা-উপশাখার অভ্যন্তরস্থ কয়েকজনের গুরু-শিষ্য পরম্পরার কথা উল্লিখিত হয়েছে। শ্রুতিগোপাল দাস(কবীর চৌরা,বেনারস),জগুদাস(বিদুপূর,বৈশালী), ভগবানদাস গোস্বামী(ভাগতাহী পন্থ,বিহার),ধর্মদাস(ছত্তিসগড়,মধ্যপ্রদেশ), বা লোকমুখে ধরমদাসকে প্রধান শিষ্যস্বরূপ গণ্য করা হয়। এছাড়া বাঘেলখণ্ড রাজ্যের শাসক রাজা বীরসিংহ কবীরকে গুরু বলে মেনেছিলেন। আবার মগহারে কবীরের

প্রয়াণকেন্দ্রিক ঘটনার সূত্রে জনৈক মুসলমান শাসক বিজলী খাঁর নামও পাওয়া গেছে। এরা প্রত্যেকেই কবীরানুরাগী ছিলেন। তবে প্রশ্ন জাগে, যিনি সম্প্রদায় সৃষ্টি ও আচারানুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন, তিনি প্রথাগত শিক্ষায় কি কাউকে দীক্ষিত করতে পারেন? তবে "তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরম অনুরাগে হয়তো গুরু হিশেবে কেউ তাঁকে মানতে পারেন। কিন্তু দীক্ষা দিয়ে কাউকে সাক্ষাৎ শিষ্য কি করতেন?"(কবীর- বীজক ও অন্যান্য কবিতা, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২৪, সাহিত্য অকাদেমি,২০০১)। লালন সেঁউড়িয়ায় বসবাস করলেও পাবনা, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি চতুর্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিষ্যদের সঙ্গে ভ্রমণের সাথে সাথে নিজ মতামত প্রচার করতেন। সেই সময়কালীন অনেক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হলেও হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

কবীর একজন গৃহস্থী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন লোই। কিন্তু একজন সমালোচক ডঃ রামকুমার বর্মা তাঁর এক অন্য পত্নীর কথা বলেছেন, যার নাম ধনিয়া বা রমজনিয়া। লালনও বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সিরাজ সাঁই নামক ফকির তাঁর সেবা শুশ্রূষা করলে হিন্দুসমাজ তাঁকে ত্যাগ করার সাথে সাথে তাঁর হিন্দু স্ত্রীও তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন।পরে ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এক মুসলমান রমণীর তিনি দার পরিগ্রহ করেছিলেন।

মধ্যযুগীয় সন্তকবি ও ভক্তকবিদের মধ্যে কবীর সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একজন পরম সন্তোষী, উদার মনোভাবাপন্ন স্বতন্ত্র প্রকৃতির, নির্ভীক, সত্যবাদী, অহিংসা, সত্য ও প্রেমের পূজারী। তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির , বাগাড়ম্বর বিরোধী তথা একজন ক্রান্তিকারী কবি। তিনি একজন মস্ত মৌলা পরোয়াহীন, ফকির ছিলেন। তিনি জন্ম থেকেই বিদ্রোহী। আর তাঁর মধ্যে বর্তমান এক অদম্য সাহস ও অখণ্ড আত্মবিশ্বাস। হিন্দু – মুসলমানের প্রবল রোষ তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। যোগীর প্রভাবে আহত হননি যেমন, তেমনি সুফী তাঁকে নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলাতে সমর্থ হয়নি। তিনি সর্বদা কদাচারের বিরোধিতা করেছিলেন। জীবনভর তিনি স্বীয় বাণীতে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ও ধার্মিক ব্যবস্থার প্রতি তীব্রতমাঘাত তিনি হেনেছিলেন। ঠিক তেমনি বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমা অবধি বাংলার ব্রাহ্মণ্যানুশাসন ও গৌড়ীয় নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি চূড়ান্ত শিখরদেশ স্পর্শ করার সাথে সাথে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ – প্রত্যেকের ক্ষেত্রে শাস্ত্রাচারমূলক অন্ধসংস্কার তীব্রাকার ধারণ করেছিল। এমনকি গ্রামীন সমাজে, মুসলমান বাঙালী সমাজে শরিয়তি অনুশাসন কায়েম করার দারুণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। লালন হিন্দু – মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে মানবিক উদারতার মহাদাদর্শের সঙ্গে মরমিয়া সাধনার বিমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। যার ফলবশতঃ তাঁর সাধন–ভজনে অন্ত্যজ নীচ বাঙালীর নিজস্ব ঘরানার মানবতন্ত্র প্রাধান্য পেতে থাকে।

কবীরের প্রকাশিত রচনা হিসাবে 'বীজক' গ্রন্থ গণ্য। এই গ্রন্থের তিনটি অংশ , যথা – সাখী, সবদ,রমৈনী। কিছু কিছু পণ্ডিতবর্গ কবীরের গ্রন্থ সংখ্যা ৫৭ থেকে ৬১ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। 'অনুরাগসার', 'উগ্রগীতা', 'নির্ভয় জ্ঞান', 'শব্দাবলী',আর 'রেখতো' ইত্যাদি গ্রন্থ কবীরের বলে মনে করেছেন। কিন্তু প্রামাণ্যস্বরূপ এগুলি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় না। তাঁর কবিতাগুলো মুক্তক হবার জন্য পরবর্তীকালের সন্ত কবিসম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় ভঙ্গিমার সাহায্যে সেগুলিকে বিস্তারিত করেছেন। কবি লালনও সিরাজের কাছে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি তাঁর সেই সাধনার ফল জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। আসলে আর্তসেবা তাঁর জীবনের অন্যতমাদর্শ। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদব করেছিলেন।তাই ১১৬ বছরের জীবনে তিনি রচনা করেছিলেন অজস্র বাউল সঙ্গীত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি তাঁর বাউলগানগুলি রচনা করেছিলেন – যা বাংলা সাহিত্য সমাজে এক মূল্যবান আকর হয়ে রয়েছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে –"রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালন শাহ ফকিরের কুড়িটি গান সর্বপ্রথম 'প্রবাসী'-র 'হারামণি'-শীর্ষক বিভাগে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী,১৩২২,আশ্বিন-মাঘ সংখ্যা)। ইহার পূর্বে লালনের

দুই-চারিটি গান কোনো কোনো সংগীত-সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম অতগুলি গান প্রকাশ করিয়া লালনের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। এই গানগুলি খুব সম্ভব লালনের আখড়ায় রক্ষিত একটি খাতা হইতে নকল করিয়া লওয়া হয়, পরে রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আকারে সেগুলি প্রকাশ করেন।"(বাংলার বাউল ও বাউল গান, ' ফকির লালন শাহ'; পৃষ্ঠা-১)।

কবীর ও লালন – উভয়েরই জীবনকথা কিছুটা রহস্যাবৃত। কেউ বলেছেন তাঁরা হিন্দুধর্মাবলম্বী। কেউ বা বলেছেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে সমগ্র সাহিত্য–সারস্বত সমাজে কবীর ও লালন – দুজনেই হিন্দু না মুসলমান – তা বলা বাতুলতার সামিল। তবে দুজনেই সংকীর্ণ জাতপাতের ঊর্দ্ধে বিরাজমান। অসাম্প্রদায়িক উদারপন্থী মানবতাবাদ মতাদর্শের জয়ধ্বনি করেছেন দুজনেই জীবনভর তাঁদের কাব্যে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক ঐক্যের বাণী উদগীত হয়েছে তাঁদের কণ্ঠে। তাঁদের কাছে সর্বমানবসত্তা নিগূঢ় তাৎপর্যে এক ও অবিভাজ্য। এঁরা দুজনেই ধর্ম ও জাতিভেদ উপেক্ষা করেছিলেন।তাই তাঁদের কাছে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অনুপস্থিত; ফলতঃ কবীর ও লালন ফকির – উভয়ের মুক্তাঙ্গনে মিলন ঘটেছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –"...বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু – মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে।"

কবীর ছিলেন নিরাকারবাদী। তাঁর ধারণা, নিরাকারের প্রাপ্তি জ্ঞান থেকেই তা সম্ভবপর। তাই এটিকে বাইরে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, 'হিবদে সরোবরহৈ অবিনাসী।' তিনি বারংবার 'রাম' শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রাম সগুণ অর্থাৎ দাশরথি রাম না হয়ে পরম ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ। রামকে আহ্বানার্থে যে আবশ্যকতা, যে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস তাঁর মনোমধ্যে ক্রিয়াশীল তাই কোনো না কোনো নাম প্রদান করা উচিত। তাঁর ভাষায় –" দশরথ সুত তিহু লোক বখানা।/ রাম নাম কা মরম হৈ আনা।। / তু হরথি গুণ পাই।" সমালোচক আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন- "আরম্ভ সে হী কবীর হিন্দু ভাব কী উপাসনা কী ঔর আকর্ষিত হো রহে থে। অতঃ উন দিনো, জব কি রামানন্দজী কী বড়ী ধূম থী,অবশ্য বে উনকে সৎসঙ্গ মে ভী সম্মিলিত হোতে রহে হোগে। জৈসা আগে কহা জায়েগা, রামানুজ কী শিষ্য-পরম্পরা মে হোতে হুএ ভী রামানন্দজী ভক্তি কা এক অলগ উদার মার্গ নিকল রহে থে জিসমে জাতি-পাঁতি কা ভেদ ঔর খানপান কা আচার দূর কর দিয়া গয়া থা। অতঃ ইসমে কোই সন্দেহ নহী কী কবীর কো 'রামনাম' রামানন্দ জী সে হী প্রাপ্ত হুআ। পর আগে চলকর কবীরকে 'রাম' রামানন্দকে 'রাম' সে ভিন্ন হো গএ।" (হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস- আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল, পৃষ্ঠা-৫, লোকভারতী প্রকাশন,২০০২, এলাহাবাদ)। —লালন ফকিরও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। সুরে সুর মিলিয়ে রাম–রহিম ও হরিকে একাত্মারূপে চিহ্নিত করেছেন তিনি – " রাম কি রহিম করিম কালুল্যা কালা / হরি হরি আত্মা জীবনদত্তা / এক চাঁদ জীবন উজালা।" লালন এও লিখেছেন – " যে যা ভাবে সেই রূপ হয়। / রাম রহিম করিম আলী এক আজ্ঞা জগতময়।"

কবীর একেশ্বরবাদী। তবে এই একেশ্বরবাদ মুসলিম একেশ্বরবাদ থেকে পৃথক, ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু কবীর দ্বারা প্রতিবাদিত ঈশ্বর ব্যাপক ও সর্বময়; এটি অগোচরীভূত ও বর্ণনাতীত। কবীরের প্রেমভক্তি এমনই এক রাজকার্য – যেখানে উচ্চ – নীচ, ব্রাহ্মণ–শূদ্র ও স্পৃশ্য–অস্পৃশ্যের কোনো প্রশ্নই উঠে আসে না – " জাতি পাঁতি পুঁছে সহি কোই, হরি কো ভজে সো হরি কো হোই।" লালন মানুষকে স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। তিনিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বদা লক্ষ্য করে বলেছেন – "করিম–রহিম রাধা–কালী এ বুল সে বুল যতই বলি / শব্দ ভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে / মানবদেহে থাকে স্বয়ং একই শক্তি ধরে।"—কবীর ও লালনের এই প্রেমভাবনা ও ভক্তিকে মধুর ও সহজ পথের পথিক করে তুলেছে। আসলে কবীর ভক্তি ও প্রেমের সাহায্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এই শুদ্ধ ভাবনাই রহস্যবাদের জন্ম দিয়েছে। এমনকি কবীর পরমাত্মাকে পতি ও আত্মাকে পত্নীরূপে কল্পনা

করে প্রেমকে এক মহানাদর্শস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন – যা অত্যন্ত ভব্যরূপ লাভ করেছে। লালনও কবীরের ন্যায় তাঁর গীতিতে জীবাত্মা–পরমাত্মার সম্পর্কে অজস্র গভীর তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়েছেন।

নাথপন্থীদের ন্যায় কবীরও ইন্দ্রিয় সাধনা, প্রাণ সাধনা আর মন সাধনার উপর জোর দিয়েছেন। 'অজপা', 'সুরতি','নিরঞ্জন','নাড়ীসাধন'ও'কুণ্ডলিনী সাধন'ইত্যাদি সাধনতত্ত্বের কথা কবীরের সঙ্গীতের পরাকাষ্ঠা নির্মাণ করলেও কৃচ্ছ্রসাধনার্থে হঠযোগ তিনি মানেন নি; তাঁর একমাত্রাভিপ্রেত ছিল সহজযোগ। তবে তাঁর এই সহজ সাধনরূপের প্রতি যে সুতীব্র ঝোঁক তা রামানন্দের প্রভাববশতঃ। সেই কারণবশতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীর জটিল ক্রিয়া,আড়ম্বর,অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরিবর্তে কবীরের মধ্যে বৈষ্ণবীয় প্রগতিবাদ,জৈনের সত্য ও হিংসা,বৌদ্ধের বুদ্ধিবাদিতার সহাবস্থান লক্ষ্যণীয়। লালনও বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের বৈষ্ণবীয় প্রীতি ও সুফী মার্গের সাধনা ও আদর্শের মিশ্রণ তাঁর গীতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আসলে লালন সহজিয়া জীবনসাধক। মানুষকে জানাই তাঁর একমাত্র সাধনা।

কবীরের কাব্যের বিষয় ভক্তি –তন্ময়তা -- যা একমাত্র অনুভূতির বিচার্য বিষয়। তাঁর অভিব্যক্তি প্রবণতা ভাষাশক্তির বহির্ভূত – কিন্তু সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে কবীরের যোগীরূপে অত্যন্ত কলাত্মকাভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কবীর রূপের সাহায্যে অরূপের ব্যঞ্জনা করেছেন। কবীরের কাব্যের চরম রূপের প্রকাশ ঘটেছে -- কথনের সাহায্যে অকথনীয়ের প্রকাশ ঘটানোতে। এটাই কবীরের কবিকর্মের সবথেকে বড় শক্তি –"জাতে সহ মাথা নহী,নাহী রূপক রূপ। / পহুপ বাসথৈ পাতলা, ঐসা তত্ত্ব অনুপ।।"আসলে এখানে সুহ ও কল্প উপলক্ষ্য মাত্র। এগুলি রূপ ও সীমার অন্তর্ভুক্ত। এগুলি মন ও বুদ্ধিও বটে। এখানে মোহ, মায়া–মমতা নেই। লালন তাঁর রচনাতেও সীম-অসীম , রূপ–অরূপের সাধনার কথা প্রাণময় ভাষায় উপস্থাপিত হয়ে অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছেন।এক সহজিয়া বৈষ্ণবের আন্তর সাধনের রূপ,মরমিয়া সাধকের অন্তর্গূঢ় গভীরতা ও সুফী সাধকের প্রেম সাধনা তাঁর গানের মধ্যে আভাসিত – "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়। / ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখির পায়।"

কবীরকে হিন্দী সাহিত্যাঙ্গনে আদি রহস্যবাদী কবি বলা হয়। যদিও সমালোচকেরা কবীরের এই রহস্যবাদকে দুই কোটিতে স্থিত করেছেন—১) ভাবনাত্মক রহস্যবাদ ২) সাধনাত্মক রহস্যবাদ। কবীরের মধ্যে রহস্যবাদের এই দুই রূপের সমাবেশ থাকলেও এই রহস্যানুভূতি স্পষ্টায়িত হয়ে উঠেছে রূপকাশ্রয়ের নিরীখে। তিনি নিজ প্রিয়তমের অলৌকিক সৌন্দর্যরাশির প্রতি বিমুগ্ধ, আত্মহারা। ঈশ্বর তাঁর জন্য যোগ ও গূঢ়ের সমানানির্বচনীয় ও অকল্পনীয়। তাই তাঁর বক্তব্য, 'কহত কবীর পুকার কে, অদ্‌ভুত কহিএ তাহি।"কবীরের অনুভূতির তীব্রতা, বেদনার আতুরতা ও ব্যাকুলতার গভীরতা বর্তমানের রহস্যবাদী কবিদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কবীর মিলনাতুরতার কলাত্মকতা ও বিরহ–বেদনার মার্মিকতার যে বর্ণনা দিয়েছেন , তা একান্তই দুর্লভ। সেইদিক থেকে কবীর হিন্দী সাহিত্যে অদ্বিতীয়—"আখাড়িয়া ঝাই পড়ী,পন্থ নিহারি- নিহারি / জীভড়িয়া ছালা পড়য়া রাম পুকারি পুকারি।। / সুখিয়া সব সংসার হৈ খাবে গুরু মৌরে। / দুখিয়া, দাস কবীর হৈ, জাগে গুরু রৌবে।।"লালনও বহুদিনের পারস্পরিক লোকায়ত মতের নির্জন মতের পথিক। তাঁর গানে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদশূন্য চিরশুভ্র উদার মানবতাদর্শের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। সীম–অসীম, জীবাত্মা–পরমাত্মা সম্পর্কিত গভীর মর্মকথা তিনি শুনিয়েছেন।একদিকে সীম, অন্যদিকে অসীম, একদিকে বন্ধন, অন্যদিকে মুক্তি,একদিকে দ্বৈত, অন্যদিকে অদ্বৈত – এই দুই হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেমের পরশ তাঁর সাধনার বিষয়—" ভজন–সাধন, প্রেম-উপার্জন/ মহারাগের কারণ।/ আগে হৃদয়ে জ্বাল জ্ঞানের আলো,/ হবে তত্ত্ব নিরূপণ।" আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সম্পর্কে কবীরের চিত্র অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী- "লাল্লী মেরে লাল কী জিত দেখু তিত লাল।/ লালী দেখন মৈঁ গয়ী মৈঁ ভী হো গয়ী লাল।।"অথবা, "জ্যুঁ জল মৈঁ পৈসিন নিকসে ।য়ুঁ টরি মিল্যা জুলাহা।"লালন ফকিরও জীবনের সুখ-দুঃখের দিবারজনীতে ঊর্ধ্বস্তরালোকে

নির্বিকল্প জগতে পরমার্থের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন—" বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে ।/ (ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলবে বাতি, দিবারাতি নাই সেখানে।।"

কবীর সর্বদা বিরহ–সন্তাপ সহ্য করেছে।রাত্রির সমাপনের পশ্চাৎলোকে চাতক- চাতকীর মিলন সম্ভবপর। কিন্তু কবীরের কাছে দিন-রাত দুই-ই সমান। যদিও অনেক বিরহের ইতি নেই –" চকরী বিসুরী রৈন কী আঈ মিলী পরমাতি।/ জো জন বিসুরে রাম সে তে দিন মিলে ন রাতি।। / বিরহ কমণ্ডল কর লিয়ে বৈরাগী দীক্ত নৈ। / মাঙ্গে দরস মধুকরী ছকে রহে দিন রৈন।। /বাসরি সুখ না চৈন সুখ, না সুখ সপনে মাহ।/কবীর বিসুড় য়া রাম সু না সুখ ধূপ ন ছাহ।"লালনও তাঁর প্রেম-বিরহের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন –"প্রেম–ডুবারু বিনে কে জানে।/ ও সে জেনে প্রেমের গতি/কুটিল অতি/ডোবে গহীনে।।"

কবীরের মধ্যে গভীর রহস্যানুভূতি, বিরহ–ব্যাকুলতার সঞ্চার,আত্মসমর্পণের উৎকণ্ঠা,প্রেমপূর্ণ উক্তি,আন্তরিক প্রেমনিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। পরমাত্মা মিলনের উৎকৃষ্ট অভিলাষ, বিরহিণীর বিরহ–পেশল হৃদয়ের বিভিন্ন পরিস্থিতির বড় হৃদয়প্লাবী কালাত্মক চিত্র উপলব্ধ হয়েছে -- যেখানে ভাবনাত্মক রহস্যবাদের আদর্শ নিজস্ব পূর্ণতাপ্রাপ্তি পেয়েছে।কবীরের প্রণয়াত্মক চিত্রে শৃঙ্গারের স্বরূপ লৌকিক না অলৌকিক যাই হোক না কেন, এক অনুপম রসের সঞ্চার বিদ্যমান। এটি স্বীয় লৌকিক রূপে ঘর – গৃহস্থের ক্ষেত্রে যতটা আহ্লাদক, ততটা মুমূর্ষুজনের ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক। তবে কেউ কেউ কবীরের রহস্যবাদে সুফী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রেমের এই স্বরূপ সন্তমতে, মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের বিট্‌ঠল সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত রূপে এসেছে। তবে সাধনাত্মক রহস্যবাদের দেখা পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে।কবীরের উপর যোগী বা হঠযোগের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তাঁর সাহিত্যে ইড়া, পিঙ্গলা,সুষুম্না,গট্‌ঠল , ত্রিমুখী,ব্রহ্মরন্ধ্র, সূর্য, চন্দ্র – এই সমস্ত পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে—যেখানে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য দ্যোতিত হয়েছে। যেমন-" গগন গরজে অভী বাদল গহীর গম্ভীর।/ চহুদিসি দমকে ভীজে দাস কবীর।।"লালন এই বিষয়টির পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন এইভাবে – "মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন/লুকালে না পায় অন্বেষণ,/কালারে হারালেম তেমন/ ওরূপ হেরিয়ে স্বপনে।।" কখনো উলটবাসীদের সাহায্যে রহস্যভাবনাকে প্রকটিত করেছেন কবীর । যথা- 'বরসে কম্বল ভীজে পানী।'সেখানে লালন বলেছে-"গঙ্গায় রইলে গঙ্গাজল হয়,/ গর্তে গেলে কূপজল কয়/বেদ–বিচারে।" কখনো শংকরের অদ্বৈতবাদের প্রভাব মিলেছে কবীরের দোঁহায় – 'জল মৈঁ কুম্ভ উর কুম্ভ মৈঁ জল হৈ ভীতর বাহর পানী । / ফুটা কুম্ভ জল জলহি সমানা য়হ তক কথৌ গারমী।।"শংকর যেমন আত্মা আর পরমাত্মার মিলনে মায়ার প্রবল অবরোধ স্বীকার করেছেন, ঠিক তেমনি কবীরও মায়ার অবরোধক তত্ত্বকে মেনে নিয়েছেন। তিনি শংকরের সমান ঈশ্বরকে জ্ঞানগম্য বলেছেন। আবার কোথাও শংকরের ন্যায় সংসারকে মিথ্যা বলে মনে করেছেন।

কবীর জাতিগত, বংশগত, ধর্মগত, সংস্কারগত, বিশ্বাসগত আর শাস্ত্রগত রূঢ় ও পরম্পরার মায়াজালকে পুরোমাত্রায় ছিন্ন- ভিন্ন করে দিয়েছেন।বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উপর ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন –"তুম কিস প্রকার ব্রাহ্মণ হো ওর হম কিস প্রকার শূদ্র, হম কিস প্রকার ঘৃণিত রক্ত হৈ ওর তুম কিস প্রকার পবিত্র দুধ হো।"লালনের গানে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ থাকলেও তিনি মানুষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা জাতের বড়াই করি -- জাত নিয়ে কত গর্ব, কত ঘৃণা করে থাকি, অথচ জাতের স্বরূপ নেই।লালনের কাছে মানুষের প্রকৃত পরিচয় মানবতাদর্শ। সমাজজীবনের উপেক্ষিত মানবতাকেই তুলে ধরেছেন সবার সামনে। সর্বমানবের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন প্রেম-প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে। লালন বলেন,সত্যাধিষ্ঠান হৃদয়ে–তীর্থে, ব্রতে- আচারে; বর্ণে ও সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নেই। প্রেমের পথই সত্য প্রাপ্তির পথ।লালন প্রেমের কবি,মানুষের কবি, মনুষ্যত্বের কবি। কুসংস্কার, অসাম্য, জাতিভেদের বিরুদ্ধে লালন গান বেঁধেছেন। তিনি বলেছেন – " সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।/ লালন কয় জাতের বিচার দেখলাম না এ নজরে।"রবীন্দ্রনাথ লালনের মানবতাবাদের প্রশংসা করে তাঁকে উপনিষদের

ঋষির সঙ্গে তুলনায়িত করেছেন। আসলে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির পুরোধাস্বরূপ ও ঋত্বিক কবিপুরুষ লালন ফকির ছিলেন একজন 'Prophet of Humanity'।

কবীর যেমন জাতিতে – জাতিতে,ধর্মে-ধর্মে কোনো পার্থক্য দেখেননি, লালন তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো বিভেদ দেখেননি। তিনি জাতির প্রশ্নে তাঁর মানবতাবোধের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।আল্লাকে তিনি 'অধরকালা' এবং মহম্মদ ও চৈতন্যদেব- দুজনকেই সমভাবে ঐশী শক্তির সাহায্যে অনুপ্রাণিত করে মানবশ্রেষ্ঠস্বরূপ জ্ঞান করেছেন।আবার তাঁরাই মানব সম্প্রদায়কে উদ্ধারার্থে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ বিদ্যমান। সুফী পারিতোষিক শব্দে তাঁরা 'অল-ইনসানুল-কামেল'—'দেব-মানব'—'The perfect Man'.তাঁরাই মানবের প্রকৃত সদগুরু-পথপ্রদর্শক। তিনি গোপী- কৃষ্ণের যুগল প্রেমকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন এবং সেই প্রেম মাহাত্ম্য আনেক গানে কীর্তিত হয়েছে। বলা যায়, এ সমস্তই তাঁর ইসলাম ধর্মের পরিচয়বাহী। কবীর যেখানে বলেছে- " দুর্লভ মানুষ জন্ম হৈ, দেহ ন বারম্বার;/ তরুবর জ্যোঁ পতী ক্ষড়ে, বহুরি ন লাগে ভার।" লালন সেখানে বলেছে-"এমন মানব জমিন আর কি হবে।/ মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।।/অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই, / শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,/ দেব দেবতাগণ / করে আরাধন/ জন্ম নিতে মানবে।। "

কবীর মূলতঃ ভক্ত। তাঁর ভক্তিসাধনা কেবলমাত্র আত্ম-ভক্তি পর্যন্ত সীমিত- একথা বলা যাবে না।আসলে তাঁর ভক্তি–তন্ময়তার মধ্যে অন্তঃসংঘর্ষের সাথে লোকসংঘর্ষ ও নিবৃত্তির সাথে প্রবৃত্তির প্রভাব ক্রিয়াশীল। তিনি একদিকে ভক্ত, কবি ; অন্যদিকে সুধাকর ও যুগনেতা। সেই সময়কালীন যুগচেতনার রূপমাধ্যম ছিল ধর্ম।ঈশ্বরোপাসনাধিকারের চাহিদা বাস্তবে আর্থিক-সামাজিক ন্যায়সংগত চাহিদা ছিল।তার উপর সেই আব্রু, মর্যাদাকে ভেঙে ফেলার চাহিদা থাকার দরুণ বিশাল জনসমূহকে স্বাধিকার বঞ্চিত করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। আসলে সেই সময়কালীন জনান্দোলনের ব্রাহ্মরূপ মর্মান্তিক রূপ ধারণ করায় সমস্ত উদ্‌বুদ্ধ নেতা ধর্মের নামে মানবমুক্তি ও মানব মাত্রই সমান ও ঐক্যের উপর জোর প্রদর্শন করেছিলেন। সমাজের বুকে গজিয়ে ওঠা সামাজিক কুকীর্তি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার,সাম্প্রদায়িক কঠোরতা, ব্রাহ্ম বিধি- বিধান ও কর্মকাণ্ডের আড়ম্বরপ্রিয়তার উপর খোলাখুলি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন নেতৃবৃন্দ। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,সমাজের বুকে চলতে থাকা সামাজিক, ধর্মীয় বা আর্থিক - যে শোষণই হোক না কেন,তা রদ করা।এই ধরণের যুগগত মূলীভূত সমস্যার চিত্রণ কবীরের কাব্যমধ্যেও প্রভাব ফেলেছে।লালন ফকিরও সহজিয়া জীবনসাধক। তাঁর সাধনায় পৌত্তলিকতার স্থান অনুপস্থিত। সমাজজীবনের কোনো গতানুগতিকতার মধ্যে তিনি আবদ্ধ না থেকে কৃত্রিম সামাজিক আচারসর্বস্বতা,সংস্কার, বিধি- বিধান,লোকাচার,জাতিপাতি,শ্রেণীভেদ-বৈষম্য, বর্ণভেদপ্রথা ও শাস্ত্রসংহিতা-- সমস্ত কিছুই অগ্রাহ্য করেছেন—তাঁরই প্রতিফলন তাঁর গানগুলিতে পড়েছে।

কবীরের সমকালীন দেশে ধর্মের আর এক ধারার প্রবহমানতা নজরে আসে—সেটি হল সুফী সাধনার ধারা। সুফী সম্প্রদায় ইসলামের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী নয় ; তবে ঈশ্বরকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তস্বরূপ জ্ঞান করতেন।এই লোকতন্ত্র উলেমাদের ন্যায় কট্টর ও সংকীর্ণ মতবাদী প্রকৃতির ছিল না।তার উপর মুসলিম শরিয়তের উপর এঁদের গভীর আস্থা ছিল। লালন যেমন সুফী সাধনার শব্দ ও কোরানের তত্ত্বকথা বাউল পদে ব্যবহার করেছেন,তেমনি বহু পদে বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ ও চৈতন্যদেবের বন্দনা করে অধ্যাত্মমার্গের পদ রচনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। তবে সাধারণ হিন্দু সমাজে এবং শরিয়তি মুসলমানদের নিকট এই বে-শরা ফকীরপন্থী নিন্দিত হয়েছিল।কবীরের সময়কালীন ও তৎপূর্বে ধার্মিকান্দোলনস্বরূপ জনতার বিদ্রোহ ত্রিধারায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। আর জ্ঞানবাদী কবীর এই ধারাকে সম্যক রূপে আত্মসাৎ করে সর্বসাধারণের জন্য এক সামান্যতম মার্গ সুনির্দিষ্টকরণ করেছেন—"পোথী পড়ি-পড়ি,জগ-মুআ, পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।/তাই আখর প্রেম কা,পড়ে সো

পণ্ডিত হোয়।। " সমালোচক ড.হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর ভাষায় –" কবীর ঐসে হী মিলনবিন্দু পর খড়ে থে, জহাঁ সে এক ওর হিন্দুত্ব নিকল জাতা হৈ, ওর দুসরী ওর মুসলমানত্ব;জহাঁ এক ওর জ্ঞান নিকল জাতা হৈ ওর দুসরী ওর অশিক্ষা;জহাঁ এক ওর ভক্তিমার্গ নিকল জাতা হৈ ওর দুসরী ওর যোগ মার্গ; জহাঁ সে এক ওর নির্গুণ ভাবনা নিকল জাতী হৈ ওর দুসরী ওর সগুণ সাধনা – উসী প্রশস্ত চৌরাহে পর বে খড়ে থে। বে দোনো ওর দেখ সকতে থে ওর পরস্পর বিরুদ্ধ দিশা মেঁ গয়ে হুএ মার্গো কে দোষ, গুণ উনহে স্পষ্ট দিখাই দে রহে থে কবীর কা ভগবদ্দত্ত সৌভাগ্য থা। উনহোনে ইসকা খুব উপযোগ ভী কিয়া।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ধর্মীয় শোষণ ও সামাজিকাবিচার প্রবলাকার ধারণ করলে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা,ধর্মীয় ব্যাভিচার ও সম্প্রদায়ভেদে সাধারণ মানুষ নিদারুণভাবে পীড়িত হয়।লালনের গানে সেই বিভিন্নানাচার ও ভেদাভেদ লাঞ্ছিত পর্য্যুদস্ত মানুষের দুর্গতি থেকে মুক্তির বাণী প্রচারিত হয়েছে। লালন যে সমাজজীবনের প্রতি উদাসীন মনোভাবাপন্ন – তা সমাজে মানবতার অধোগতিরার্থে।সেই কারণে সামাজিক বিধি- বিধান,আচারানুষ্ঠান,শাস্ত্রসংহিতা,ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি ও অনুদারতা এবং দেবমন্দির ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধতাবশতঃ মানসিক প্রতিক্রিয়া লালনের গানে জায়গা করে নিয়েছে। সহজ মানসিকতা ও আত্মিক সাধনার্থে মানুষের প্রতি আহবানধ্বনি অনুরণিত হয়েছে লালন সংগীতে— " ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে।/ আছে কোন মানুষের বসত কোন দলে।। / অযোনি সহজ সংস্কার-/ তারে কি সন্ধানে একবার?/বড় গহীন মানুষ লীলে /ওরে মানুষ লীলে।। "অথবা, মানুষ-ও সত্য হয় মনে / সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।। "

কবীর রহস্যময়ী অনুভূতি স্পষ্ট করার জন্য তিনি রূপক ও অন্যোক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন – "হংসা প্যারে সরবর তজি কহ জায়? /জোহি সরবর বিচ মোতী চুনকে বহু বিদ্য কেলি করায়।।" অথবা, "সন্তো ভাই আই জ্ঞান কী আঁধি রে। /ভ্রম কী টাটী সবে উড়ানী মায়া রহে ন বান্ধী রে।। " ভাবকে অতি সহজে চমৎকৃত করার জন্য অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রূপক- উপমা- উৎপ্রেক্ষা- প্রতিবস্তূপমা – যমক – অনুপ্রাস – মালোপমা- বিরোধাভাস-দৃষ্টান্ত-,অর্থান্তরন্যাস তথা পর্যাযোক্তি ইত্যাদি অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ বৈচিত্র্য মিলেছে তাঁর দোঁহায়। রূপক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে তিনি এতটাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ যে, যেমন কালিদাস নিজ উপমার ক্ষেত্রে। উদাহরণ- "নৈনো কী ঝরি কোঠরি পুতলী পলঙ্গ বিছাই। /পলকো কী চিক ভারী কে পিয় কো লিয়া রিমাই।। "লালনের গানেও রূপকের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য—" ষোলকলা হলে শশী /তাকে বলে পূর্ণমাসী ।/ সেই পূর্ণিমা হয় কিসি / পণ্ডিতেরা কয় সংসারে।। "

কবীর নিজ শৈলীর স্বয়ং নির্মাতা। তাঁর সমস্ত কাব্য মুক্তক শৈলীতে রচিত।তাঁর মধ্যে প্রভাবাত্মকতা,বল,ওজঃ গুণের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর ভাষা খিচড়ি ভাষা। কবীরের কবিত্বশৈলীতে যথেষ্ট সরসতা,দ্রবণশীলতা ও মার্মিকতা দৃষ্ট হয়। কবীর তাঁর কাব্যে বিরহিণী আত্মার স্পন্দন, হাস্য ও রোদন, মিলন ও বিচ্ছেদের সাকার চিত্রাঙ্কন করেছেন। ফলতঃ সেই স্থানে তাঁর সন্ত,সাধক,কবি,ভক্ত,সুধারক ও নেতা—সমস্ত প্রকার রূপ এক হয়ে গেছে।তার ফলবশতঃ তাঁর কাব্য এক অলৌকিক বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর এই সৌন্দর্যপূর্ণ চিত্রের উপস্থাপন- "সুপনে মে সাঁই মিলে,মোব্বত নিয়া জাগায়। /আখ ন খোলু ডরপতা, মতি সপনা হো জায়না নৈনো অন্দর আর তু নৈন ঝাঁপি তোহী লেউঁ।/না মৈঁ দেখু ক না তোহি দেখন দেউঁ।। "লালনের গানেও আছে-"জগত শক্তিতে ভুলালে সাঁই। /ভক্তি দাও হে যাতে চরণ পাই।। / রাঙা চরণ দেখত বলে / বাঞ্ছা সদয় হৃদ-কমলে, / তোমার নামের মিঠায় মন মজেছে। / রূপ কেমন তাই দেখতে চাই।। "

কবি ও সাধক লালন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, রহস্যময়, প্রতীকী দ্যোতনা প্রভৃতির সাহায্যে যেমন বাউল সাধনতত্ত্বের গূঢ় রহস্যাভাস ফুটিয়ে তুলেছেন ,তেমনি সাধনরসকেও কাব্যরসে পরিবর্তিত করেছেন-"বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।/(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে।। / কত কুমীর ভরা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে। / ভবে রসিক যারা পার হয় তারা তারাই নদীর ধারা চিনে।।"আবার যখন বলে ওঠেন-

" চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য নজরে। / চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘর্।। / হলে সে চাঁদের সাধন / অধর চাঁদ হয় দরশন / আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ঘিরে।।"- তখন তাঁর অন্তরালে বাউলসাধনার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হলেও এর কাব্যরস অতি উপাদেয়। কবীরের দোঁহাতেও সেই রহস্যবাদাভিব্যক্তিরানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তবে সেই অনুভূতি ভাবনার সঙ্গে সম্বন্ধিত। আর এই অনুভূতি প্রেমজ বলেই জীব আর ব্রহ্মের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত। প্রেমের চরম পরিণতি দাম্পত্যপ্রেমে সমাপ্ত হলেও রহস্যবাদাভিব্যক্তি সর্বদা প্রিয়তম ও বিরহণীকে কেন্দ্রায়িত করেই সম্ভব। কবীর সেই রহস্যাভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর দোঁহাতে – " ঘট সমুদ্র লহ না পড়ে উড়ে লহর অপার। /দিল দরিয়া সমরথ বিনা কৌন উগরে পার।।"

কবীর নির্গুণ রাম ও ভক্তিতত্ত্বের দিক থেকে সিদ্ধ ও নাথপন্থীদের থেকে পৃথক। তবে তাঁর এই ভক্তি সাধনা অনন্য ভাব থেকে সুসম্পন্ন। যদিও এতে কর্মকাণ্ডের বিধি-বিধান, ব্রাহ্মাচারের কোনো অবকাশ চোখে পড়ে না।এটি সর্বত্র নিষ্কাম প্রকৃতির। তাই ঈশ্বরের নাম জপ সাধনার মধ্যে দিয়েই সাধিত হয়েছে জীবাত্মার মনে শান্তির সূচনা। সেইসঙ্গে মায়া –মোহ সমস্ত বিদূরিত হয়েছে।রাত্রিদিন সুখের ছায়ানুভবের সাথে সমগ্র হৃদয়ব্যাপী ঈশ্বরের রূপের প্রকাশ লক্ষিত হয়-" হরি সঙ্গত শীতল ভয়া, মিঠী মোহ কী তাপ। / নিশিবাসর সুখ নিধি, লহা অন্ন প্রগটা আপ।।" লালন ফকিরও তাঁর একটি গানে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা হৃদয়ের অকপট প্রকাশভঙ্গিতে ব্যক্ত করে প্রাণের সামগ্রী করে তুলেছেন-" কৃষ্ণপ্রেম যার মনে, / তার বিক্রম সে-ই তা জানে;/ অধীন লালন বলে, আমার/ মুখসর্বস্ব মন বিবাগী।।"

লালনের গানেও কখনো ইসলামি সুফী পারিভাষিক শব্দধারা, কখনো বা হিন্দুর যোগতন্ত্রাদি থেকে সাধন প্রক্রিয়ার ধারা অনুসৃত হয়েছে। কোথাও বা চৈতন্যদেবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কবি আবার ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলাদর্শে কয়েকটি পদ রচনা করেছেন – "কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই।/ একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই।। / শোকে তোর পিতা নন্দ / কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ/ আরও সবে নিরানন্দ ধেনু গাই।।" – এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর সখ্যরসের পরিচয় মেলে। ইসলামি রীতির গানেও কবি পুরোমাত্রায় ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন- " নবির অঙ্গে জগত পয়দা হয়। / সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়।।/ আবদুল্লার ঘরে বলো / সেই নবীর জন্ম হলো/ মূল দেহ কোথায় রইল শুধাবো কোথায়।।/ কিরূপে নবী জান সে / মুক্ত হয় রাগের বীজে / আব-হায়াত যার নাম লিখেছে হাওয়া সেই সেথায়।।"অথবা, "অন্ধজনেরে পয়দা করে খোদ ছুরাতে পরওয়ার। / ছুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল সে কি হঠাৎকার।।/ নূরের মানে হয় কোরানে,/ নুর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে,- /কেমন করে নুর চুয়ায়ে হয় সংসার।।" অথবা, "এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা আলমপানা তুমি। / ডোবায়ে ভাসাইতে পারো,/ ভাসায়ে কেনারে দাও কারো,/ যা কবে তাই হনে তোমার-/তাইতো তোমায় ডাকি আমি।।" -কবীরের ভক্তি সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে হল প্রেমলীলা। কবীর লিখেছে-"হরিসে লাগ রহ ভাই। / তু বনত বনত বলি যাইয়া।"

সত্যকাব্য আর সত্যকলার গভীরানুভূতির সত্যতা – কবীর এই সত্যতার উপর দণ্ডায়মান। তাঁর কাগজ লেখার উপর বিশ্বাস নেই,চোখে দেখার উপর তাঁর আগাধ বিশ্বাস। তিনি বিনা কারণবশতঃ আড়ম্বর ও কৃত্রিমতাকে, জনজীবনসন্ধানী অনুভূতিকে সহজ-সরল আর সোজা ঢঙে অভিব্যক্ত করেছেন।তার উপর অলঙ্কারের ব্যবহারারোপ করার প্রচেষ্টা চালাননি,পরন্তু তার মধ্যে আছে জীবনের সত্য,- যা নির্মল,স্ফটিক মণিসম দেদীপ্যমান। কবীরের সহজ-সরল শব্দের আত্মাভিব্যক্তি তাঁর অতুল আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে অনুপ্রাণিত- যা সহজে হৃদয়ে প্রভাব ফেলেছে।তাই সন্ত কবি কবীর ও বাউল কবি লালন ফকিরও সাহিত্য আর ধর্মের ক্ষেত্রে এক নবীন ক্রান্তির জনক। বলা যায়, আলোচনার এক নবীন শৈলীর জন্মদাতা তথা সফল কবি। তাই তাঁদের রচনা নিঃসন্দেহে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাহিত্যর এক বিশিষ্ট সম্পদ।।

গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলার বাউল ও বাউল গান – উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, দীপান্বিতা,১৩৬৪; কলকাতা।

২) কবীর – ক্ষিতিমোহন সেন। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫, কলকাতা।

৩) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ ১৯৯৫, কলকাতা।

৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – শ্রীমন্তকুমার জানা। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি,জুলাই ১৯৮৬, কলকাতা।

৫)বাংলা সাহিত্যর সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্রগুপ্ত।২০০০, কলকাতা।

৬)বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ) –ড. দেবেশকুমার আচার্য্য। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি; জানুয়ারি ২০০৪,কলকাতা।

৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – বিজিত ঘোষ। কলকাতা।

৮) কবীর গ্রন্থাবলী – গোবিন্দ সিংহ। সাহনী পাবলিকেশন্স। ২০১৮, দিল্লী।

৯) দোহাবলী – উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), কলকাতা।

১০) হিন্দী সাহিত্যঃ যুগ ও প্রবৃত্তিয়াঁ – ড.শিবকুমার শর্মা। অশোক প্রকাশন, দিল্লী।

১১) হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস – আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল। লোকভারতী প্রকাশন,২০০২, এলাহাবাদ।

১২)কবীর-বীজক ও অন্যান্য কবিতা – সংকলন ও অনুবাদঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১,কলকাতা।

১৩)কবীর ঔর কবীর-পন্থ – কেদারনাথ দ্বিবেদী। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ,১৯৯৫।

১৪) সন্ত কবীর ঔর ভগতাহী পন্থ – শুকদেব সিংহ । বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন,১৯৯৮।

১৫) কবীর – হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। রাজকমল প্রকাশন,১৯৯৯, নয়া দিল্লী।